

চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত- ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর পর্ব

ড. শত্রুঘ্ন কাহার, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ স্কুদিরাম স্মৃতি
মহাবিদ্যালয়

Submitted on: 21.02.2024

Accepted on 25.03.2025

সংক্ষিপ্তসার- উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমজীবীদের ইতিহাস ও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। ঔপনিবেশিক আমলে চা শিল্পের বিকাশের পিছনে যে শোষণ, প্রলোভন ও শ্রমিক নিপীড়নের ইতিহাস রয়েছে, তার নির্মম চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে উত্তরবঙ্গে চা শিল্প গড়ে ওঠে, প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলে এবং পরে তরাই অঞ্চলে। জমির দখল, বন ধ্বংস এবং ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের মত রোগের প্রকোপ ঘটে। স্থানীয় নেপালি শ্রমিকের অভাব মেটাতে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য আড়কাঠি ব্যবস্থার অপব্যবহার, অত্যন্ত নিম্ন মজুরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগব্যাধি ও সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকরা জীবন অতিবাহিত করতেন। তারা অল্প মজুরিতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করত। পুরুষ, নারী ও শিশুদের মজুরিতে বৈষম্য ছিল এবং নানা অজুহাতে মজুরি কাটা হত। মালিক ও আড়কাঠিদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। স্বাধীনতার পরেও শ্রমিকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি; বরং কাগজে-কলমে শ্রম-আইন প্রণয়ন হলেও তা প্রয়োগে বড়সড় গাফিলতি দেখা যায়। ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্ধারণ, বাসস্থান ও চিকিৎসার আইনি বিধান থাকলেও তা বাস্তবে প্রযোজ্য হয়নি। বাগান মালিক, সর্দার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য বহাল থাকে। ভোট-রাজনীতির আবহে শ্রমিকরা জাতীয় মূলস্রোতের রাজনীতির সাথে যুক্ত হলেও, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। এই প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের সংগ্রাম, শোষণ ও শ্রম আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ- চা, শিল্প, শ্রমিক, উত্তরবঙ্গ, শ্রমআইন, আড়কাঠি।

সকাল সকাল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রাজ্য জুড়ে কতই না বঞ্চনার চুলচেরা আলোচনা করা হয়ে থাকে, অথচ হাতের কাপে থাকা চা এর উৎপাদক সেই শ্রমজীবীদের বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের কাছে অজানাই থেকে যায়।

বাংলায় সরকার বদলায়, শ্রমজীবীদের পরিস্থিতি নয়। বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এই শ্রমজীবীদের বঞ্চনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন ঘটায় মাত্র। বাগিচা শিল্পের ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্লান্টেশন বা বাগিচা বলতে মূলত বাগিচা মালিকদের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন বড় বড় খামারে চালানো কৃষিকাজকে বোঝায়। কিন্তু বাংলায় প্লান্টেশন বা বাগিচা বলতে শোষণের কতগুলি বাহ্যিক রূপ বোঝাত যা ছোট ছোট চাষীদের স্বাস্রোধ করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজির আনুকূল্যে ভারতে কৃষিনির্ভর কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে জুট, কফি, রবার, নীলের পাশাপাশি চা বাগিচা শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানি স্থাপনের মাধ্যমে ভারতে চা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়।^১ যদিও মেজর রবার্ট ব্রুকস এর ১৬ বছর আগে ১৮২৩ সালে আসামের ঘন জঙ্গলে চা গাছের সন্ধান পান। ১৮৩৯ সালের পরবর্তী তিন দশকে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ইউরোপীয় মালিকদের অধীনে চা বাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আসামের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি জমির দখল পর্ব শেষ হলে এবং সেখানে পতিত জমির অভাব ক্রমশ ঘনীভূত হলে ইউরোপীয় পুঁজির নজর এসে পড়ে বাংলার উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী ভূমিতে। দার্জিলিংয়ের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি চা উৎপাদনের অনুকূল হওয়ায় ১৮৪১ সালে ডা. ক্যাম্বেল উত্তরবঙ্গে চা চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাপক ভাবে সফল হয় এবং পরবর্তী দু'দশকের মধ্যে দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলে চা শিল্প বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করে এবং বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করে ফেলে। ১৮৬০ এর দশকের মধ্যে দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলে নতুন চা চাষের জমির অভাব দেখা দিলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজিপতির ক্রমশ পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলে নেমে আসে।^২ খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাগিচার সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দার্জিলিং অঞ্চলে ১৯৫০ এর দশকে চা শিল্প প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হলেও ১৮৭২ সালে ১৪০০০ একর জমিতে ৭৪টি চা বাগান গড়ে ওঠে, ১৮৮১ তে এই সংখ্যা ১৫৩তে পৌঁছায় যা প্রায় ৩০,০০০ একর জমি জুড়ে প্রসারিত ছিল, ১৮৯১ সালে প্রায় ৪৫,০০০ একর জমি জুড়ে ১৭৭টি চা বাগান গড়ে ওঠে। সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ১৮৭৪ থেকে ১৯০৫ মাত্র ৩০ বছরে চা চাষের জমি বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় দেড়গুণ।^৩

Number of gardens from 1874-1905

Year	Number of gardens	Area under cultivation in Acres	Outturn of tea in lbs.
1874	113	18,888	39,27,911
1885	175	88,499	90,90,298
1895	186	48,692	1,17,14,551
1905	148	50,618	1,24,47,471

LSSO' Malley, Bengal District Gazetteers Darjeeling, Delhi, 1st publication 1907, 1st Reprint Version 2001, Page- 94.

চা বাগানের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু নতুন সমস্যা দেখা দিতে আরম্ভ করল। পার্বত্য অঞ্চলে চা বাগিচার সাথে তরাই অঞ্চলের চা বাগিচার পরিবেশগত ব্যাপক পার্থক্য ছিল। ব্যাপক আকারে বন ধ্বংস তরাই অঞ্চলের পরিবেশকে আরও জটিল করে দেয়। ফলে দেখা যায় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার এর মত ভয়ঙ্কর রোগের পাদুর্ভাব।^৪ পার্বত্য অঞ্চলে নেপালি শ্রমিকের অভাব না হলেও, তারা তরাই অঞ্চলে নেমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চা চাষে সম্মত হল না। এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা শ্রমিক চাহিদা মেটানোর জন্য আড়কাঠির সাহায্য নিল। ব্যাপক সংখ্যা ধরে আনা হল ছোটনাগপুরী শ্রমিকদের। দেখতে দেখতে তরাই অঞ্চলের রূপ পাল্টে গেল। গুঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, ঘাসি, তুরি, বরাইক, মালপাহারি প্রমুখ আদিবাসীরা চা বাগানে কাজ নিল। তীব্র

উদ্বেগে তাদের থাকতে হয়েছিল। বহু শ্রমিক ঘাতক রোগে মৃত্যুবরণ করেছিল। সারা বছর শ্রমিক অপ্রতুলতা নিয়ে একটা উদ্বেগ থেকেই যেত। কিন্তু আড়কাঠিরা এক্ষেত্রে মালিকদের সহায়ক হয়েছিল। নানা প্রলোভন দেখিয়ে সর্দাররা হাজার হাজার শ্রমিক নিয়ে এসেছে চা বাগানে। পরিবর্তে পেয়েছে শ্রমিকের মাথা পিছু এক আনা, উপরন্তু শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে নজরানা, ঘুষ ইত্যাদি। এর বাইরেও ছলে বলে কৌশলে তাদের কষ্টার্জিত যৎকিঞ্চিৎ আয়ের মধ্যে ভাগ বসাত এই আড়কাঠিরা। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৬৯ সালে দার্জিলিঙের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২২,০০০। ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনা সময়পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৪,৭১২ এবং শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০১ এ তা বৃদ্ধি পায় ২,৪৯,১১৭ জন।^৬

অন্যদিকে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ চা বলয়ের বাইরে ভিন্ন রাজ্যে থেকে হওয়ায় তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অল্প মজুরি, বসবাসের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, খাদ্যভাব জনিত অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাগানে কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকের মাথা পিছু ৪ আনা, মহিলা শ্রমিকের জন্য ৩ আনা এবং যুবক যুবতীর জন্য ১ আনা ধার্য ছিল, এবং শিশুরা চা বাগানের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় মেরে আনলে তাদের মিলত এক আনা। মজুরি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য পরবর্তী ৫০-৬০ বছর অপরিবর্তনীয় ছিল যা চা বাগানের তীব্র শোষণের পৈশাচিক রূপকেই তুলে ধরে।^৭ সারা বছর চা পাতা তোলার কাজ থাকত না। পাতা তোলার মরশুমে শ্রমিকরা যত ওজনের পাতা তুলত তা সঠিক ভাবে ওজন না করে কম পয়সা দেওয়া হত। এর পাশাপাশি চলত নানা অজুহাতে শ্রমিকের মজুরি কাটার মত মালিক নির্মিত আইন। জ্বর রোগভোগের সময় শ্রমিকদের ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার করে কাজে নিয়ে আসা হত। কোন কোন বাগানে নগদ মজুরি দেওয়ার পরিবর্তে চাকতি দেওয়া হত। এই চাকতির পরিবর্তে শ্রমিকরা দোকান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে পারত। অসাধু দোকানদাররাও এই নিরক্ষর সরল শ্রমজীবী মানুষদের ঠকিয়ে প্রচুর মুনাফা করত। শ্রমিকদের মালিক, সর্দার, দোকানদারদের এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার ছিল না, প্রতিবাদ করলেই কপালে জুটত পরিবারসমেত হস্তাবাহারের মত জঘন্য শাস্তি, যেখানে প্রতিবাদী শ্রমিককে সপরিবারে বাড়ি থেকে বের করে ঘন জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হত, আসামে এই প্রথা হটাবাহার নামে পরিচিত ছিল।^৮ পুরুষ, নারী, শিশু নির্বিষসহ চা বাগানের শ্রমিকদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র দি বেঙ্গলী নামক ইংরেজি পত্রিকায় Slavery in British Dominion নামক ১৩টি প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গুলির মত ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা সরেজমিনে চা কুলিদের দুঃখ দুর্দশা তদন্ত করেছিল। ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা জুড়ে কিন্তু তার কোনও ইতিবাচক প্রভাব চা শ্রমিকদের ওপর পড়ে নি।^৯

ব্রিটিশ সরকার চা শিল্পে শুধু মাত্র মালিকদের জমি প্রদান করে ক্ষান্ত হত না, বাগান মালিকদের মুনাফা নিশ্চিত করতে তারা মালিকের পক্ষে কয়েকটি কালা কানুনও তৈরি করেছিল যেমন শ্রমিকরা বাগান কাজ করারা জন্য তিন থেকে পাঁচ বছরের চুক্তিবদ্ধ হতে হত। এর মাঝে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকদের এক থেকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আবার ফিরে আসতে হত চা বাগানে। আবার কোনও শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করলে বা সাত দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকলে মালিক বিনা ওয়ারেন্টে তাকে গ্রেফতার করতে পারতেন। আসামের চা বাগানে এই আইনগুলো যতটা কঠোরভাবে পালন করা হত, উত্তরবঙ্গে এই আইনগুলির প্রয়োগ ততটা না হলেও, শ্রমজীবীদের গতিবিধির ওপর সরকার তীব্র নজর রাখত, শ্রমজীবীদের মাঝে সরকারী গুণ্ডচরের উপস্থিতির কথাও জানা যায়।^{১০} ১৯১২ সালে জলপাইগুড়ি শ্রমিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ডুয়ার্সের শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের আইনগত পদ্ধতি যুক্ত হয়। যদিও এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। এই আইনে জলপাইগুড়িসহ অন্যান্য শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

পরিসংখ্যান সংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া বাগিচা শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক স্বাধীনতা পর্বে তেমন কোন সরকারী উদ্যোগ চোখে পড়ে না, এমনকি স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে চা বাগিচাগুলি ইউরোপীয় পুঁজিপতির কাছ থেকে এদেশীয় মালিকদের মধ্যে হাতবদল হলেও, শ্রমিকদের সামগ্রিক চিত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।^{১০}

১৯৪৭ সালে ভারত এই দীর্ঘ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের চা বাগিচার শ্রমিকদের পায়ের শিকল অচ্ছিন্নই থেকে যায়। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩০ বছর বাংলায় কংগ্রেসী আমল বাংলার চা বাগিচার শ্রমজীবীদের বঞ্চনার ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে মাত্র। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন করে, চা বাগিচার পুরুষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরি স্থির হয় ৬ টাকা এবং নারী শ্রমিকের জন্য চার থেকে পাঁচ টাকা মাসিক।^{১১} ১৯৭৬ এর পূর্ব পর্যন্ত মজুরি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বজায় ছিল। ১৯৫১ সালে বাগিচা শ্রমিক আইন প্রণীত হয় যেখানে শ্রমিকদের কাজের সময় প্রতি সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা স্থির হয়। হাটবাজারের দিন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়। যে কোন দিন কাজ, বিশ্রামের সময় এবং কাজে যোগদানের আগে অপেক্ষার সময় মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টা হতে হবে। মালিকরা শ্রমিকদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ থাকবে এবং যে সমস্ত বাগানে ৫০ এর বেশী মহিলা শ্রমিক কাজ করেন সেখানে ছয়বছরের নীচে শিশুদের জন্য ক্রেশ ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত বাগানে নারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।^{১২} স্বাধীন ভারতে চা শিল্পের শ্রমিক দরদি এই আইনগুলির বেশিরভাগই খাতায় কলমে থেকেছে, মজুরি ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা চাইতে তেমন কোনও পরিবর্তন নজর পড়ে না এমনকি মজুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য স্বাধীনতা উত্তর পর্বেও বজায় ছিল। শ্রমিকদের কথিত স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও, মালিক, সর্দারদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাধীনতা উত্তর কালে পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র, ভারতে ভোট রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যেও ভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের ভারত তথা বাংলার রাজনীতির মূল স্রোতের সাথে যুক্ত করেছিল।

১৯৪৭ সালের পূর্বেই বা বাগানে বামপন্থী আর. এস. পি দলের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে ১৫৪টি চ বাগানের মধ্যে ১১৪টিতে আর. এস. পি ও ১০ টিতে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের প্রভাব ছিল বাকী ৩০টিতে সি. পি. আই নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের প্রভাব ছিল।^{১৩} ১৯৫৪ সালে হাসিমারা সম্মেলনে প্রথম চা-শ্রমিকদের বোনাস ও পি. এফের দাবি সর্বতোভাবে তোলা হয়। এই সময় বোনাসের দাবিতে ডুয়ার্সে ১৮ দিনের শ্রমিক হরতাল হয়। নেতৃত্ব দেন ননী ভট্টাচার্য, সুরেশ তালুকদার, স্টিফেন কুজুর প্রমুখ নেতারা। হরতালের পনের দিন পর কয়েকটি শর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। আন্দোলনের সুবাদে বোনাস কমিটি গঠিত হয় এবং প্রত্যেক শ্রমিক ১৩০ টাকা করে বোনাস পায়।^{১৪} পাশাপাশি এই আন্দোলন চা বাগান ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৬০ এর দশকের গোড়া থেকেই একটা সাধারণ মঞ্চ বা ফোরাম তৈরির চেষ্টা হয়, যেখানে চা-বাগান শ্রমিকদের সাধারণ দাবিদাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত হবে। ১৯৬২ সালে কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কস নামক মঞ্চ গঠিত হয়। আই.এন.টি.ইউ.সি, এইচ.এম.এস, এ.আই.টি.ইউ.সি, ইউ.টি.ইউ.সি, এবং গোখা লীগ এই মঞ্চের সদস্য হয়। এই কমিটির অধীনেই ১৮ই আগস্ট ১৯৬৯ সালে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে ধর্মঘট সংগঠিত হয় যা ২১ দিন ধরে চলে। একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। আন্দোলনের মূলত অর্থনৈতিক দাবিই যেমন মজুরি, বোনাস, কাজের নির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি প্রাধান্য পায়।^{১৫}

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা মানুষের মনের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি মিটিয়ে মুক্তির যে আলো সঞ্চার করেছিল, কেন্দ্রে ও রাজ্যে দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে সেই আশার আলো সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত না হয়ে সরকারী

উদাসীনতায় টিমটিম করে জ্বলছিল। কেন্দ্রে নেহেরু নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রমক্ষেত্রে একাধিক আইন প্রণয়ন করলেও, মালিক শ্রেণী সেই আইনের ফাঁকফোকর অপব্যবহার করতে শুরু করে, অন্যদিকে এই আইনগুলি প্রয়োগে সরকার বিশেষ কোন সদিচ্ছা দেখায়নি। সম কাজে সম বেতনের কথা বলা হলেও তা কখনোই প্রযোজ্য হয়নি, উপরন্তু মাতৃত্বকালীন সুবিধা স্থায়ী নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, বিশাল সংখ্যা অস্থায়ী নারী শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসত না।^{১৬} স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার মালিকের উপর যাবতীয় দায় ফেলে দেয়। সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে চা-শ্রমিকের যা অবস্থা ছিল, স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বিশেষত কংগ্রেস আমলে সেই অবস্থার মূলগত কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। শুধু পাওনার মধ্যে ছিল কিছু সাংবিধানিক আইন, বোনাস এবং সক্রিয় রাজনীতি করার অধিকার। এই রাজনীতির অধিকার প্রাথমিক পর্বে বামপন্থীদের পতাকা তলেই সম্পূর্ণতা পায় এবং তাদের সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনই বাংলায় ১৯৭৭ সালে পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে আসে। কিন্তু এই পরিবর্তন তাদের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনে কতটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা আজ অনুসন্ধানের বিষয়।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে পালাবদলের সাথে পাহাড়ের জনজীবনে কোন বদল কি আমরা দেখতে পাই? না তার কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৭৪ সালে চা বাগানের মালিকপন্থী ইউনিয়নগুলি (প্রধানত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন) এবং বামপন্থী ইউনিয়নগুলির সাথে রাজ্য সরকারের যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয় তাতে স্থির হয় চা শিল্পে কোনও ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে না। প্রতি তিন বছর অন্তর মজুরি সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হবে এবং তাতে মজুরি নির্ধারিত হবে। এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় খুব অল্পই মজুরি বৃদ্ধি ঘটত।^{১৭} ২০০৫ সালে অনিচ্ছুক বাগান মালিকদের আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করার জন্য একটি স্মরণীয় এক মাসব্যাপী ধর্মঘট সত্ত্বেও, বাম সরকার ও বাগান মালিকরা টেবিলে শ্রমিকদের দাবি কার্যত অস্বীকার করে উৎপাদনশীলতা রীতি ও পরবর্তী তিন বছরের জন্য সামান্য মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। উৎপাদনশীলতা রীতি বলতে বোঝায় শ্রমিকদের তোলা পাতা ঠেকা থেকে কম হলে প্রতি কেজির জন্য এক টাকা মজুরি কাটা হবে। ২০১১ সালে বাম সরকার পতনের প্রাক্কালে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি সমতলে ৬৭ টাকা এবং পাহাড়ে ৯০ টাকা ছিল। সপ্তাহের ছয়দিন কাজ এবং কাজের দিনের জন্যই মজুরি। বেতন ছাড়া বেতনের একটা অংশ দ্রব্যে দেওয়া হত। যেমন জ্বালানী কাঠ এবং মাসে ৪০০ গ্রাম চা পাতা।^{১৮} বামদের সমকাজের সম বেতনের সেই নৈতিক দাবিও বাম আমলে বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। রেশন প্রদানের ক্ষেত্রেও নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় বৈষম্য করা হত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে বেতন বৃদ্ধি ঘটে নি। যার ফলে ২০০৩ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে খাদ্যভাব হেতু অপুষ্টি জনিত কারণে প্রায় ১২০০-র বেশী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজন মারা গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের খাদ্যের অধিকার বেঞ্চের দ্বারা নিযুক্ত এক স্পেশাল অফিসার অপুষ্টি নিয়ে যে রিপোর্ট দেন তা দেখার পর সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালে যথেষ্ট কম দামে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা, মাসে অন্তত ১৫ দিন সরকারী উদ্যোগে কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, বাগানগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং কর্মহীন শ্রমিকদের একটা ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়। এই সময় প্রায় ৩২টি বাগান বন্ধ হয়ে পড়েছিল, তাদের মালিকরা সেগুলিকে বেআইনিভাবে বন্ধ করেছিল। তারা শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন, রেশন (মজুরির যে অংশ খাদ্য শস্যে দেওয়া হয়), গ্র্যাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছিল। অথচ তথাকথিত শ্রমিকদরদি সরকার নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। বাগানগুলি যখন খোলে তখন শ্রমিকরা আর বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিই তুলতে পারে নি পাছে বাগানগুলি পুনরায় যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ভয়ে।^{১৯} শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যে বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা তলানিতে এসে ঠেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৮০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে দার্জিলিং এর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমশ উত্থান যা ২০১১ সালে

বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটায়। মা-মাটি-মানুষের শ্লোগানে বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে।

ক্ষমতায় এসেই ২০১১ সালে চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক তথা রাজ্য সরকারের ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সম্পন্ন হয় যেখানে সামান্য কিছু মজুরি বৃদ্ধি ছাড়া বিশেষ কোনও পদক্ষেপ বা শিল্প নীতির কথা উঠে আসে নি। এই চুক্তি অনুসারে শ্রমিকদের নগদ মজুরি ছিল সমতলের জেলাগুলিতে দৈনিক ৯৫ টাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে ৯০ টাকা।^{১০} ২০১৪ সালে মার্চ মাসে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও প্রায় এক বছর পর ২১ শে মার্চ ২০১৫ সালে শ্রমিকদের সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম, মালিক পক্ষ ও সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মেয়াদ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৩১শে মার্চ ২০১৭ নির্ধারিত হয়। এই চুক্তিতে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়। স্থির হয় প্রথম বছরের জন্য, অর্থাৎ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৩১শে মার্চের জন্য দৈনিক নগদ হবে ১১২.৫০ টাকা, পরের বছর তা বেড়ে হবে ১২২.৫০ টাকা এবং চুক্তির শেষ বছরে সেটা হবে ১৩২.৫০ টাকা। মজুরির একটি অংশ দ্রব্যে দেওয়ার চলন এই পর্বেও অক্ষুণ্ণ ছিল যেখানে কিছু খাদ্যশস্য, জ্বালানী কাঠ এবং ৪০০ গ্রাম চা শ্রমিকদের দেওয়া হত।^{১১} ২০১৮ সালে নবম ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় শ্রমিকদের বেতনে ১৭.৫০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং অনেক বাগান মালিক শ্রমিকদের ১৫০ টাকা (১৩২.৫০ + ১৭.৫০) দৈনিক বেতন প্রদান করতে শুরু করেছেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি তাদের পুনরায় রাস্তায় নামতে বাধ্য করে।^{১২} ২০১৯ সালে আগস্ট মাসে প্রায় তিন লাখ চা শ্রমিক তাদের দৈনিক বেতন ১৩২.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৭৬ করার জন্য ধর্মঘটে সামিল হয়।^{১৩} ২০২১ সালে চা শ্রমিকদের সংযুক্ত মঞ্চ ন্যূনতম মজুরি দাবির জন্য আন্দোলনে নামে।

স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে সেই ব্রিটিশ আমলে চা শ্রমিকদের বেতন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজের সময়, চাকরির স্থায়ীত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, স্বাধীনতা উত্তরপর্বেও সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যায়। ২০২১ সালেও চা শ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম মজুরির অধিকার অর্জন করার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।^{১৪} এমনকি তিন বছর অন্তর হওয়া ত্রিপাক্ষিক মিটিং এর জন্যও শ্রমিকদের সবসময় আন্দোলনের পথে যেতে হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের বেতন বৃদ্ধির গ্রাফে বিস্তর ফারাক তাদের দৈনন্দিন বাঁচার সংগ্রামকে ক্রমশ কঠিন করেছে। বেতনের একটি অংশ খাদ্যদ্রব্যরূপে দেওয়ার চল আজও তাদের মালিকদের দাসত্বে ছদ্ম প্রথার শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। শিক্ষার অভাব তাদের অধিকারের সংগ্রামকে আরও প্রলম্বিত করেছে। ব্রিটিশ আমল থেকে হাল আমলে তাদের সুষ্ঠু ভাবে বাঁচার অধিকারটুকু তারা পায়নি। তাই বলাই যায় বাংলার সরকার পরিবর্তন তাদের বঞ্চনার ইতিহাসে শুধু এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে মাত্র।

সূত্রনির্দেশ

১. Saha, Panchanan, *Indians in British Overseas Colonies*, Calcutta, K. P. Bagchi & Company, 2003, P- 159.
২. Malley, LSSO', *Bengal District Gazetteers Darjeeling*, Delhi, the Bengal Secretariat Book Depot, 1st publication 1907, 1st Reprint Version 2001, Page- 93.
৩. Op.cit., Page- 94.
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক, *বাংলার চা শিল্প ও শ্রমিক (১৮৫৬-১৮৭৪)*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধান শ্রমিক ইতিহাস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু প্রকাশনী'র যৌথ উদ্যোগ, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৫. A Historical outline of the migratory movement, Gorkhaland Agitation, an Information Document, Government of India, Calcutta, Director of Information, Govt. of West Bengal, 1986, P- 5.

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৯।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক, *উত্তরবঙ্গে পরিচয়* (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা, গ্রন্থতীর্থ, ২০০২।

৮. চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল, *উনিশ শতকে চা-কুলিদের সন্তানসন্ততিদেড় জীবনধারা*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২।

৯. চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ, *ঔপনিবেশিক বাগিচা ব্যবস্থায় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের আইনগত পদ্ধতি: প্রসঙ্গ ডুয়ার্স*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১-৭২।

১০. চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩।

১১. Labour Bureau, *Economic and Social Status of Women Workers in India*, New Delhi, The Labour Bureau, 1953, P-32.

১২. The Plantation Labour Act, 1951, Book-N-Trade, 2000, P-13, also, সুপর্ণা চ্যাটার্জি, *চা-বাগিচার মহিলা শ্রমিক- রাজনীতি ও সচেতনতা*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯১।

১৩. আই. বি. ফাইল নং- ১০৬৫-৪৭ (১), বিষয় এ. এইচ. বেস্টারউইচ. আর. এস. পি. এস. আলিপুরদুয়ার।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, *স্বাধীনতা-উত্তর ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিক নেতা কালাসাহেব বেস্টারউইচ*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৮।

১৫. Lahiri, Souparna, *Bonded Labour and the Tea Plantation Economy*, <https://www.revolutionarydemocracy.org/rdv6n2/tea.htm>, accessed on 12/02/2023.

১৬. চ্যাটার্জি, সুপর্ণা, *স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক আইনের আলোকে চা-বাগানের মহিলা শ্রমিক (১৯৪৭-১৯৭৭)*, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

১৭. শ্রমজীবী ভাষা, ভল্যুম-৩, ইস্যুই -৬, কলকাতা, ১ মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা-১৯।

১৮. তদেব।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮।

২০. নন্দী, ভাস্কর, *চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি*, শ্রমজীবী ভাষা, ভল্যুম ৫, ইস্যুই ১০, কলকাতা, ১ জুলাই, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১১।

২১. নন্দী, ভাস্কর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯।

২২. <https://www.thestatesman.com/cities/tea-wage-tripartite-talks-siliguri-22-feb-1502584525.html>, accessed on- 10/11/2023.

২৩. <https://www.hindustantimes.com/india-news/workers-affiliated-to-all-parties-unite-in-agitation-at-bengal-s-biggest-tea-garden/story-EdKk9l7FSLRxVB2oxOp2eM.html>, accessed on- 10/12/2023.

২৪. Chakraborty, Sandip, Tea Garden Workers Across Party Lines Decide to Fight Together for Minimum Wage in Bengal, Dated- 14 Sep 2021, <https://www.newsclick.in/tea-garden-workers-across-party-lines-decide-fight-minimum-wage-bengal>, Accessed on- 12/10/2023.